কালের চালচিত্রে
শ্রীমা সারদা

অমরেন্দ্রনাথ আদক

গ্রন্থতীর্থ

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

সবিনয় নিবেদন

২০০৩-এর বইমেলায় 'ইতিহাসের চালচিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে আমার অধ্যাত্মভাবের গুরুদেব পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী আমাকে শ্রীমায়ের বিষয়ে লেখার আদেশ করেন। এ বিষয়ে আমার সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতার কথা জানালে তিনি একাধিকবার প্রেরণা দিয়ে বলেন — হবে, চেষ্টা করো। তাঁর উৎসাহে লেখা হয় 'অমৃত কন্যা শ্রীমা সারদা'। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী সে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠে সন্তুষ্ট হয়ে সেটি তাঁর স্নেহের কৃতী ছাত্র স্বামী শিবপ্রদানন্দজীর কাছে দেখিয়ে নিতে পরামর্শ দেন। স্বামী শিবপ্রদানন্দজী কবি, বিদগ্ধ ও সম্পাদনায় দক্ষ মানুষ। শত ব্যস্ততার মধ্যেও পাণ্ডুলিপিটি অনুপুঙ্খ পাঠ করে তিনি অনেক সুপরামর্শ দেন। তাঁর স্নিগ্ধ ও স্মিত হাসির অনুশাসন আমার অন্তরকে স্পর্শ করে। গ্রন্থটি পুনর্বার পরিমার্জনায় উৎসাহিত হই এবং অনুভব করি অমৃতকন্যা শ্রীমা সারদার অমৃতস্বরূপ বলার অধিকার ও যোগ্যতা কোনোটিই আমার নেই। তাই আমার পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থের অনুসরণে গ্রন্থটির নাম রাখা হল 'কালের চালচিত্রে শ্রীমা সারদা'। শ্রীমায়ের বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে আমার মনের মধ্যে যে মাতৃমূর্তি তৈরি হয়েছে তারই প্রতিবিম্বিত রূপ উপস্থাপন করা গেল। পশ্চাতে দেওয়া হল সমকালের চালচিত্র।

পৌরাণিক দেবী-দুর্গার চালচিত্রে শীর্ষমণি থাকেন মহাকাল শিব, দুপাশে প্রাচীন কাহিনীর নানা চিত্র। মা সারদার ইতিহাস গ্রাহ্য অবস্থান, তাই চালচিত্রে ইতিহাসের কথা, শিবস্থানে আছেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সমকালের ইতিহাসের রথ দ্রুতগতিতে ধাবমান, তার উপরে অধ্যাত্ম লোকের স্নিগ্ধ আলো ফেলছেন মা সারদা, কীভাবে সে আলো আভাসিত হচ্ছে তারই আলোচনা আছে গ্রন্থমধ্যে। মনে হতে পারে ইতিহাসের ঢাকটি আরতির ঘণ্টাধ্বনিকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আমার সবিনয় কৈফিয়ত, ঢাকের স্বভাবই ঐ, ওটি নীরব হলে ভালো লাগে, কিন্তু না বাজলে পূজাটি মনে ধরে না। ইতিহাসের ঐ রণবাদ্যির ক্ষণ স্থায়িত্বের পরেও শ্রীমায়ের কথা ধীর পদসঞ্চারে বিশ্বমানবের মনে কী ভাবে স্থান নিচ্ছে সেটিই আমার আলোচ্য।

গ্রন্থটি রচনায় আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে গেছেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠের কর্মাধ্যক্ষ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, চেরাপুঞ্জি (মেঘালয়) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সুমেধানন্দজী, আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বরানন্দজী ও কর্মীগণ এবং হুগলি জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের কর্মীবৃন্দ। তাঁদের সকলকে প্রণাম।

বর্তমানে গ্রন্থ প্রকাশে খুবই আর্থিক ঝুঁকি আছে। তথাপি গ্রন্থতীর্থের প্রবীণ প্রকাশক মাননীয় শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় — অবতরণের ইতিকথা — শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণ- শ্রীরাধা বুদ্ধদেব-গোপা, যিশুখ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্যদেব, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবীর আগমনকাল ও অবদানের সারসংক্ষেপ ও শ্রীমায়ের অনন্যতা। ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় — মায়ের আগমন — জন্মকাল, জন্মস্থান, সংক্ষিপ্ত বাল্যজীবন, পিতৃবংশ পরিচয়, সমকালের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা, বিবাহ, সামাজিক প্রেক্ষাপট। ১৭

তৃতীয় অধ্যায় — দীক্ষা গ্রহণ — শ্বশুরালয়ে গমন, শ্রীঠাকুরের কাছে শিক্ষাগ্রহণ, সন্তান কামনার তাৎপর্য, সহনশীলতা, যোগেশ্বরী ভৈরবীর বিদায়, শ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন, শ্রীমায়ের পিত্রালয়ে গমন, ভানুপিসির শান্তিকুঞ্জ, দক্ষিণেশ্বর যাত্রায় প্রস্তাবনা। ২২

চতুর্থ অধ্যায় — অভিসার — শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বর যাত্রা, পথটি কোথা দিয়ে ছিল, পথে কোথায় অসুস্থ হয়েছিলেন ? জ্বরের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের দেবী দর্শনের তাৎপর্য, পৌছানোর তারিখ, শ্রীঠাকুরের স্বাভাবিক ব্যবহার, ষোড়শীজ্ঞানে শ্রীঠাকুরের পূজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, চণ্ডীদাসের রাধার কৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীমায়ের রামকৃষ্ণ প্রেমের তুলনা। ২৬

পঞ্চম অধ্যায় — জীবন সাধনা — চন্দ্রমণি দেবীর সেবা, শ্রীঠাকুরের কাছে বিভিন্ন দেবদেবীর বীজমন্ত্র শিক্ষা, নহবত ঘরে ক্ষুদ্র কক্ষে কঠিন কর্মসাধনা, শ্রীঠাকুরের সময়ে কলকাতা বাসের সময়কাল কত ? শ্রীঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর ও শ্রীমায়ের পিতা রামচন্দ্রের মৃত্যু, সংসারে কঠিন দারিদ্র্য, কলকাতা ও দেশে গমনাগমনকাল, ডাকাতবাবার কাহিনি সম্বন্ধে নতুন তথ্য, হৃদয়রামের দুর্ব্যবহার ও পরিণতি, ত্যাগী ভক্তদের আগমন, নহবত ঘরে রাত্রির তপস্যা, দেবী চণ্ডীর নয়টি কবচ ও মা সারদা। ৩১

ষষ্ঠ অধ্যায় — জীবন যখন শুকায়ে যায় — শ্রীমায়ের দুঃখের জীবন, লক্ষ্মী দিদির জীবনের বিপর্যয় ও মায়ের কাছে অবস্থান, এক অজ্ঞাত পাগলিনী, ভবতারিণী মন্দিরে এক ভৈরবী, গৌরী মা, যোগীনমা, গোলাপমা এঁদের মায়ের কাছে আশ্রয়। মায়ের ভাব। ৪১

সপ্তম অধ্যায় — দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা — দেবতা প্রিয়জন ও প্রিয়জন দেবতা কি ভাবে হন, গোপাল মায়ের কাহিনি, গোপাল মা ও নিবেদিতা, নিষ্কামনায় সিদ্ধ মা, গোপাল মায়ের অনুভবে শ্রীঠাকুর ও শ্রীমা রূপে ভিন্ন - স্বরূপে এক। ৪৭

অষ্টম অধ্যায় — অমৃতপুত্রের মহাসমাধি — শ্রীঠাকুরের গলরোগ, দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ, শ্যামপুকুর ও কাশীপুর উদ্যানে মায়ের কঠোর কর্মযোগ, শ্রীমাকে শ্রীঠাকুরের দায়িত্ব দান, শ্রীঠাকুরের মহা সমাধি। ৫১

নবম অধ্যায় — তিমির বিদার উদার অভ্যুদয় — শ্রীচৈতন্যদেবের রাধাভাব ধারণ ও শ্রীমায়ের রামকৃষ্ণ প্রেমের তুলনা, শ্রীমায়ের শোকের বৈশিষ্ট্য, শ্রীঠাকুরের জ্যোতির্ময় সত্ত্বার অবস্থানের কথা জ্ঞাপন, কাপড়ে সরুপাড় ও হাতে বালা রাখার কারণ, বৈধব্যের নববেশের তাৎপর্য, শোকের মধ্যেও ঈশ্বর ভাবনায় সমাহিত থাকা। ৫৮

দশম অধ্যায় — তীর্থরেণুতে নতুন তীর্থের অন্বেষণ — কাশীপুর উদ্যানবাড়ি ত্যাগ, তীর্থভ্রমণ, দীক্ষাদানের নির্দেশ প্রাপ্তি, স্বামী যোগানন্দকে মন্ত্রদান, বরাহনগর মঠ স্থাপন, শ্রীমায়ের কামারপুকুর গমন, কামারপুকুরের অবস্থান্তর, চরম দারিদ্র্যে দিনযাপন, কলকাতা গমন। ৬১

একাদশ অধ্যায় — সত্য সত্য জননী — কলকাতার বলরামভবনের পরিজন, বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে অবস্থান ও ধ্যান, পুরী গমন, আঁটপুর আগমন, দ্বিতীয়বার কামারপুকুর গমন, হরিশচন্দ্র কুণ্ডুর কাহিনি, গয়া গমন, বুদ্ধগয়ায় সাধু নিবাস দেখে শ্রীমায়ের প্রার্থনা, বলরাম বসু ও সুরেন মিত্রের দেহত্যাগ, ঘুসুড়ির শ্মশানধারে ভাড়া বাড়িতে অবস্থান, নরেন্দ্রনাথের প্রব্রজ্যার অনুমোদন, গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্রের মৃত্যু, গিরিশচন্দ্রের জয়রামবাটি গমন, গিরিশচন্দ্রের কাছে মায়ের স্বীকারোক্তি — 'আমি-ই সত্য সত্য জননী'। ৬৬

দ্বাদশ অধ্যায় — দুর্গতিনাশিনী মা — নরেন্দ্রনাথকে আমেরিকা গমনের অনুমতি ও আশীর্বাদ দান, পঞ্চতপা ব্রতানুষ্ঠান, কৃষ্ণভাবিনীদেবীর কন্যাশোক,

শ্রীমায়ের কৈলোয়ার গমন, ঐ কালে নরেন্দ্রনাথের পত্রে শ্রীমায়ের মহিমা কথন ও জ্যান্ত দুর্গা ও সীতারূপে তুলনা, স্বামীজির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনের প্রস্তাবনা, জ্যান্ত দুর্গার পূজার সংকল্পের সঙ্গে মঠের আদর্শের কোথায় সামঞ্জস্য ? মঠভূমির জন্য মানুষ ও প্রকৃতির সাধনা। ৭৩

ত্রয়োদশ অধ্যায় বিদেশিনী তিন কন্যা ও শ্রীমা — সারা ওলি বুল, জোসেফিন ম্যাক্‌লাউড ও মার্গারেট নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা)-দের কন্যা রূপে গ্রহণ করে বিশ্ব মাতৃত্বের প্রকাশ। ৮২

চতুর্দশ অধ্যায় পূর্ণমিদম্—স্বামী যোগানন্দ ও ভাই অভয়চরণের মৃত্যু, সংসারে মায়া স্বীকার, বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা, মঠ সম্বন্ধে জনগণের ভ্রান্তি-লোপ ও অনুরাগ, শ্রীমায়ের পূজাগ্রহণ ও করুণা। শান্তিপাঠের মর্মার্থ। ৮৮

পঞ্চদশ অধ্যায় মায়ার মাঝে মায়াতীতা — ১৬ নং বোসপাড়া লেনের ভাড়া বাড়ি থেকে জয়রামবাটি গমন, স্বামীজির মহাসমাধি, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিকৃতি রাখা বিষয়ে অসাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ১৯০৪-এ কলকাতা প্রত্যাবর্তন, এনটালির ভক্ত সমাজে, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে, পুরীতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বঙ্গ রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন, নীলমাধব খুড়োর মৃত্যু, জাত-পাত বিষয়ে মায়ের উদারতা। ৯৪

ষোড়শ অধ্যায় স্বদেশি আন্দোলন ও শ্রীমা — স্বামীজির দেহত্যাগের পর বাংলার জাগরণ, বঙ্গভঙ্গ আইন, স্বদেশি আন্দোলন, কোয়ালপাড়া আশ্রম, ঋষি অরবিন্দ, অরবিন্দ পত্নী মৃণালিনী, ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ে সত্যই কী ঘটেছিল, দেবব্রত বসু (প্রজ্ঞানন্দ) শচীন্দ্রনাথ সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ) প্রভৃতি বিপ্লবীগণ, বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা প্রত্যাহার, বাঘা যতীনের মাতৃপ্রণাম, প্রফুল্লমুখী বসুকে অভয়দান, ননীবালা দেবীর মাতৃসান্নিধ্যে আসার বাসনা ও পুলিশি নিগ্রহ, সিন্ধুবালা ঘোষের নিগ্রহে শ্রীমায়ের প্রতিক্রিয়া, শ্রীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজির জাতিভেদ প্রথার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকারে গান্ধিজির হরিজন আন্দোলন এবং বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতা। ১০০

সপ্তদশ অধ্যায় শুভদায়িনী, ফলহারিণী মা — কোয়ালপাড়া আশ্রমে শ্রীঠাকুর ও মায়ের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা, কলকাতায় মায়ের বাড়িতে (উদ্বোধন) পদার্পণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ও My Master as I saw

him রচনা, ওড়িশার কোঠার, দক্ষিণভারতে তীর্থ দর্শন ও ভক্তের আকুতি, ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগ ও মায়ের কাতরতা, নেপালী সাধুনীর দেহত্যাগ ও শ্রীমায়ের করুণা। ১০৮

অষ্টাদশ অধ্যায় মহাকালের আহ্বান — গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঠাকুরের প্রিয় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু ও মায়ের স্নেহের ভাই বরদার দেহাবসান, শ্রীমায়ের মায়ার বাঁধন কেটে দেওয়া। ১১৪

ঊনবিংশ অধ্যায় কালের চালচিত্র — অবতারগণের আগমন সংকটকালে সংকট মুক্তির জন্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাষ্ট্রনায়কদের মিথ্যাচার বিষয়ে সাবধানবাণী, জাতীয় আন্দোলন, গান্ধিজির অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন, শ্রীঠাকুরের জন্মভূমি ও শ্রীমায়ের জন্মভূমিগুলি ক্রয়ের ব্যবস্থা, পরবর্তীকালে নির্মিত মন্দির মূর্তি ও মূর্ত মানবের সেবার কেন্দ্র, দেশের জাগ্রত বিবেক। ১১৭

বিংশ অধ্যায় মায়ের প্রতিমা — মাঝি বউ, সন্তানহারা মা, বর্গক্ষত্রিয় ছাত্র, ভাবিনী দেবী প্রভৃতির উপর করুণা, প্রথম ক্ষণক্রোধের উদ্রেক ও লীলা সম্বরণের প্রার্থনা, জয়রামবাটী থেকে বিদায়, শরীরের ক্রম-অবনতি, একের পর এক প্রিয় সন্তানদের মৃত্যু-সংবাদ, মায়াত্যাগ ও শান্তিপথের সন্ধানদান, মহাসমাধি, মায়ের স্নেহের আঁচলের ক্রম বিস্তার। ১২১

প্রথম অধ্যায়

অবতরণের ইতিকথা

শ্রীমা সারদামণি দেবীই প্রথমা, অনন্যা ও অতুলনীয়া। তিনি-ই প্রথম অবতার-সহধর্মিনী যিনি স্বামীর নশ্বরদেহ গত হওয়ার পরেও নিজ জীবনের রথটিকে আরও ৩৪বছর টেনে নিয়ে গেছেন, প্রারব্ধ কাজ শেষ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি প্রথমা, যিনি কঠিন বাস্তব জীবনের রূঢ় বন্ধুর পথে হেঁটেছেন নিজেকে আদর্শ মা রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তিনি সন্তানকে অভয় দিয়ে বলেছেন, 'বিপদে, সংকটে, রোগে, দুঃখ-শোকে যদি তোমার পাশে আর কেউ না থাকে তবে মনে রেখো তোমার একজন মা আছেন।' এত বড় বরাভয় তো আর কেউ দেননি।

ত্রেতা যুগের শ্রীরামচন্দ্র পার্থিব পুরুষ অথবা বাল্মিকীর কল্পলোক সম্ভূত তা নিয়ে পণ্ডিতদের বিতর্কের অন্ত নেই। তবু কয়েক হাজার বছর ধরে ভারতবাসীর মনোভূমিতে শ্রীরামচন্দ্র অভ্রান্ত সত্য হয়ে উঠেছেন। তিনি ভারতের অন্যতম আদর্শ রাজা, পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, বন্ধু, মিত্র। সবেরই আদর্শ তিনি, তাই রামের অয়ন বা পথই ভারতবাসীর অনুগমনের, অনুসরণের সরণি। তাঁর ঘরণী সীতা সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বলেছেন—

'অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা
বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।' [১]

সূর্যপ্রভাসমা উজ্জ্বল, ত্রিলোকে বিশুদ্ধা, জনকরাজদুহিতা সীতার জীবনটি ছিল ৪৫ বছরের। কন্যারূপে ছ'বছর, স্ত্রীরূপে অযোধ্যায় প্রথম বারো বছর, বনবাসে প্রায় তেরো বছর, রাবণের অবরোধে অশোক বনে এক বছর, আর অযোধ্যায় সুখী বধূরূপে মাত্র এক বছর এবং জীবনের শেষ বারো বছর কাটিয়েছেন বাল্মীকির আশ্রমে।[২] সীতা চরিত্রের মতো পবিত্রতার কারণে শ্রীমা বলতে পারেন আমিই সীতা। সীতা ও সারদা দু'জনেই দুঃখের সরণি দিয়ে জীবনপথ অতিক্রম করেছেন। দুই মহাজীবনের অনেক সাদৃশ্য। তথাপি সীতা সারদার মতো মা হয়ে ওঠেননি, তাঁকে পরিত্রাণ পরায়ণী বলে কখনো আমাদের মনে হয়না।

দ্বাপর যুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং', তিনি পরমাত্মা। শ্রীরাধা তাঁরই অন্য অংশভাগ, জীবাত্মা রূপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আরাধিকা। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রেষ্ঠ আরাধিকা, মধ্যে রাধিকা হয়ে শেষে রাধা নাম পেয়েছেন।

---

১. বাল্মিকী রামায়ণ

২. রামায়ণ কথা—স্বামী তথাগতানন্দ। রামায়ণের চরিতাবলী—সুখময় ভট্টাচার্য।

তিনি ভক্ত হৃদয়ে প্রেমের ধারা। তাঁর কৃপা না হলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হয় না। তাঁর অতনুসম্ভব প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ আবৃত। এই শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীমা একাত্মতা অনুভব করে বলেন— আমি-ই রাধা। শ্রীরাধিকা মধুর রসের সাধিকা। তাঁর প্রেম "নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।" শ্রীরাধা ও শ্রীসারদা উভয়ের প্রেমের এখানেই সাদৃশ্য। কিন্তু শ্রীরাধাকে কেউ কখনো ভুলেও মা বলে ডাকেনি। তাই শ্রীসারদা ও শ্রীরাধার ভাবগত পার্থক্য ভক্ত মাত্রেরই পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণের পর সম্পূর্ণ ইতিহাসের চরিত্র শ্রীবুদ্ধদেব। সম্রাট অশোকের রাজত্বের আগে ৫৬৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধদনের পুত্ররূপে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর দর্শিত ধর্মই প্রথম ভারত-ভূখণ্ডের বাইরে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে তাঁর পত্নী গোপার কোনো ভূমিকা ছিল না।

বুদ্ধদেবের পর, দু'হাজার বছর আগে অবতার রূপে এলেন যিশুখ্রিস্ট। প্যালেস্টাইনে তাঁর জন্ম। বেদান্ত ধর্মের সঙ্গে তাঁর প্রচারিত ধর্মের অনেক সাদৃশ্য। তাঁর কোনো পত্নী ছিলেন না, তাই তাঁর অবদান অন্বেষণ অপ্রাসঙ্গিক।

যিশু খ্রিস্টের পর মক্কার সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন হজরত মহম্মদ। ঐতিহাসিক ইবনে ইশ্‌হাকের মতে তাঁর জন্ম ২০ আগস্ট, ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ, মতান্তরে ২০/২১ অথবা ২২ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। তিনি নিরাকার একেশ্বরবাদের অনুগামী। তাঁর উদার মহৎবোধের জন্য তিনি সংস্কারবদ্ধ মানুষের কাছে ক্রমাগত নির্যাতন সহ্য করেছেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রমজান মাসে তাঁর কাছে পবিত্র কোরআন-এর আবির্ভাব। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বর মক্কায় প্রাণসংশয় হলে তিনি মদিনায় চলে যান। এই দিন থেকে হিজরী সন গণনা করা হয়েছে। ২৫ বছর বয়সে তিনি এক ৪০বছর বয়স্কা পবিত্র-চরিত্রা বিধবাকে বিবাহ করেন। নাম বেগম খাদিজা। তিনিই প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম ধর্ম প্রচারে বেগম খাদিজার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা জানা যায় না।

৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের কেরল রাজ্যের কালাডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শঙ্করাচার্য। বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্মকে তিনি স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। অসাধারণ মেধা, স্মৃতিশক্তি, ব্যক্তিত্বের অধিকারী আচার্য শংকর মাত্র ৮ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি মহীশূরে তুঙ্গভদ্রাতীরে শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকায় গোমতী তীরে সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ ও বদরীতে অলকানন্দা তীরে যোশী বা জ্যোতি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, আজও সেগুলি সনাতন ধর্মরক্ষার দুর্গরূপে কাজ করছে। তিনি আধুনিক কালের আদর্শ আচার্য। সন্ন্যাসী সমূহের সাধন রীতি ও ভাব অনুযায়ী দশটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দশটি নাম দেন। এঁদেরই দশনামী সম্প্রদায় বলা হয়। (১) তীর্থ, (২) বন, (৩) অরণ্য, (৪) গিরি, (৫) পুরী, (৬) ভারতী, (৭) পর্বত, (৮) সাগর, (৯) সরস্বতী, (১০) আশ্রম। এ দশটি সম্প্রদায় সনাতন ধর্মের বৈচিত্র্য ও ঐক্যের প্রকাশক। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে, ৮২০ খ্রিস্টাব্দে অকৃতদার এই মহান সন্ন্যাসীর জীবনাবসান ঘটে।

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বাংলার নবদ্বীপের আকাশে পূর্ণ চন্দ্রোদয় হয়েছিল। সেদিন নবদ্বীপের মাটিতেও এক চন্দ্রের উদয় হয় — তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। সেই চন্দ্রালোকে দেখা গিয়েছিল অতীতের শ্রীকৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য। ঐ সঙ্গে শ্রীরাধার মহাভাব-অঙ্গেধারণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র।

বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট হওয়ার কালে ফতেসাহ, মোজাফর সাহর পর রাজত্ব করছিলেন হুসেন সাহ। নবদ্বীপের শাসক তখন হুসেন সাহের দৌহিত্র চাঁদ কাজী। নবদ্বীপ তখন বঙ্গসংস্কৃতির পীঠস্থান। অসাধারণ রূপবান তরুণ শিক্ষক বিশ্বম্ভর মিশ্র তখন পাণ্ডিত্যের চাঞ্চল্যে অস্থির। স্বর্গত পিতার আত্মার উদ্দেশে গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে অহংকারবর্জিত বৈষ্ণবভাবে জেগে উঠলেন। তাঁর প্রেমের বন্যায় ভেসে গেল বঙ্গভূমি। মাত্র ৪৮ বছরের জীবনের মধ্যে প্রথম ২৪ বছর নবদ্বীপে গৃহী। বাকি জীবন সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে নীলাচলে অবস্থান। শেষ ২৪ বছরের মধ্যে ১৮ বছর ছিলেন দিব্যোন্মাদ অবস্থায়। এতেই তিনি যুগত্রাতা এক মহানায়ক, যাঁকে কেন্দ্র করে দেশের সাহিত্য, সংগীত, জীবনীকাব্য শুধু গড়ে উঠল না, সৃষ্টি হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। সে ধর্মের গভীর তত্ত্বের মধ্যেও একটি লোকমান্য সমাজদর্শন ছিল।

অনুগামীদের জন্য তাঁর আদর্শের বার্তা—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুণা
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

"তৃণের থেকেও নত হয়ে থাকো। বৃক্ষের থেকেও সহিষ্ণু হও, সামান্যকে অসামান্য মান্যতা দাও, সদা শ্রীহরির গুণকীর্তন কর।" মাত্র চারটি উপদেশ। কী সুদূরপ্রসারী তার প্রতিক্রিয়া!

শ্রীহরির নামগানে আত্মবিশ্বাস হবে, সংসারের তুচ্ছতায় নিমজ্জিত মন ক্রমে উন্নীত হয়ে জীবন ও মৃত্যুকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পারবে। সকলকে মান্যতা দিলে মাননীয় হবে। এর বিপরীত পথ সন্ত্রাস। একটি সন্ত্রাস—বৃহত্তর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। সে পথে স্থায়ী শান্তি আসে না।

শাসক চাঁদকাজী কীর্তন নিষিদ্ধ করেছিলেন। শ্রীনিমাই রাজআজ্ঞা অমান্য করে রাজপথে নামলেন, কারণ মৃত্যুভয়কে তিনি জয় করেছেন। তিনি কয়েকজন সম-ভাব মগ্ন সঙ্গীকে নিয়ে পথে নেমে কীর্তন শুরু করতেই সমগ্র নবদ্বীপবাসী নামগান সমুদ্রে সামিল হলেন। সেই হরিভক্তিপরায়ণ জনারণ্য দেখে চাঁদকাজী আদেশ প্রত্যাহার করে শ্রীনিমাইয়ের হাতে সম্মতি সূচক খোন্তা দান করলেন। সেই প্রথম নিরস্ত্র প্রজাপুঞ্জের প্রতিবাদ সশস্ত্র রাজশক্তিকে পরাভূত করল। বিনয় যে মানুষকে ইস্পাতের মতো কঠিন করে শ্রীচৈতন্য তার প্রথম প্রমাণ। তিনি প্রথম রাজাজ্ঞা অমান্যকারী প্রতিবাদী মানুষ।

শ্রীচৈতন্য ভাবনিমগ্ন সাধক বলে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি সমাজ ও সংসারকে

সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেননি। দিব্যভাবে-বিভোর মানুষটি নিজ জননীর সেবার জন্য গদাধর নামক এক ভক্তকে নিযুক্ত করেছিলেন।

গৌড়েশ্বর হোসেন সাহের দুই প্রধান অমাত্য রূপ ও সনাতনকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিতে উত্তরবঙ্গের রামকেলিতে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। ঐ সময় নবদ্বীপে গিয়ে মাতৃদর্শন করেছিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখদর্শন না করেও নিজ পাদুকাদ্বয় তাঁকে দিয়ে গেলেন। সেই পাদুকাই হল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেই পাদুকার পূজা করতে করতে তাঁর উপলব্ধি হয় শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তমণ্ডলী তাঁর প্রিয়জন। তাঁর মনে হয় 'যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণরে'। সেটিই নবদ্বীপবাসীর প্রাণের ভজনা-মন্ত্র হয়ে ওঠে ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁরা মাতৃজ্ঞানে গ্রহণ করেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি। একটি অশ্রুরেখার মতো হরিসংকীর্তনের পালাগানে থেকে গেলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীচৈতন্যের পর এলেন (১৮৩৬ খ্রি.) শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ইতিহাসের অত্যাধুনিক কাল শুরু হয়েছে। ধর্ম ও সমাজ জীবনের সমস্যা এ যুগে একরৈখিক নয়। বিদেশি শাসন ও সংস্কৃতির অভিঘাতে সমস্যা বহুমুখী। সমগ্র জাতি তাঁর দীর্ঘ ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে বুঝি পরিত্যাগ করবে! স্ব-ধর্ম ও সামাজিকরীতি নীতিকে আক্রমণ করেছে নিজেদের অন্তরের সংশয়-রাক্ষস। অসিতে বা বাঁশিতে সে রাক্ষসের প্রাণসংহার সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়ে এলেন অতি কোমল এক মাতৃভাব। এ ভাব বিশুদ্ধ, তার কামনা বাসনা, প্রত্যাশাহীন স্নেহে। এ স্নেহের শক্তি তার মৃদুতায়। মহাভারতে আছে—

'মৃদুণা দারুণং হন্তি মৃদুণা হন্ত্যাদরুণম্।
নাসেব্যং মৃদুণা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীক্ষ্ণতরং মৃদু।'

"মৃদুতা দ্বারা কঠোর জিত হয়, মৃদুতা দ্বারা অকঠোরও জিত হয়, মৃদুতা দ্বারা অভিভূত হয় না এমন কিছুই নেই।" মাতৃভাবের সুনিবিড় স্নেহে যে কত শক্তি আছে তা জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁর স্নেহের বাঁধনে ধরা পড়লেন আস্তিক, নাস্তিক সংশয়বাদী সকলেই। একটি সন্তান সংঘের সূচনা করলেন তিনি। আর শ্রীঠাকুরের মাতৃভাবের জীবন্ত মূর্তি হলেন শ্রীমা সারদা। ছোটো একটি সন্তান সংঘের মা হয়ে প্রথম দর্শন দান। ক্রমে তিনি হলেন সকল আর্তের আশ্রয়, পথহারা উদ্‌ভ্রান্তের সামনে সঠিক দিশা, তৃষিত মানুষের পরম তৃপ্তির শান্তিনিকেতন। তিনি অতুলনীয়া মা, যাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন আগে ধর্ম ইতিহাসে দেখেননি কেউ। তিনিই জগজ্জননী রূপে বন্দিতা প্রথম অনন্যা মানব-নন্দিনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মায়ের আগমন

দেশে প্রথম রেলপথ স্থাপনের কাজ চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষাব্রতী এখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এইসময় মাঠের পর মাঠ পায়ে হেঁটে কলকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে পৌঁছোলেন শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়। সাকিন হুগলি জেলার অখ্যাত গ্রাম কামারপুকুর। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, যিনি সত্যের জন্য সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে, নিঃস্ব হয়েছিলেন। সেই সত্যাশ্রয়ী ক্ষুদিরামের তিন পুত্র। শ্রীরামকুমার, শ্রীরামেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ। গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য একটি নাম। তিনি দাদার ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে পড়বেন এবং প্রৌঢ় দাদাকে সাহায্য করবেন—এই জন্য কলকাতা আগমন। এই আগমনের যুগসম্ভাবী অন্য তাৎপর্য ছিল। ঐ কালে আর একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা ঘটল।

কামারপুকুর থেকে তিন মাইল পশ্চিমে জয়রামবাটী গ্রাম। সে গ্রামের পুণ্যি পুকুরের পাড়ে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী মুখোপাধ্যায় বাস করেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর, বাংলা ১২৬০ সালের ৮ পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে সূর্যাস্তের পর ২ দণ্ড ৯ পলে অর্থাৎ ৫১ মিনিট পরে ব্রাহ্মণপল্লিতে যখন ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাহ্নিকে মগ্ন এবং গ্রামস্থ হিন্দুপল্লিতে গৃহবধূরা, শঙ্খধ্বনিসহ সন্ধ্যাদীপ জ্বালছিলেন সেই ক্ষণে, এক কন্যা জন্মগ্রহণ করলেন। মা শখ করে নাম রাখলেন ক্ষেমঙ্করী, যার অর্থ মঙ্গলময়ী।

কয়েকদিন পরে শ্যামাসুন্দরী দেবীর বোন দিনময়ী এলেন দিদির মেয়েকে দেখতে। তাঁর অনুরোধে—দিদি, আমার মেয়েটি তো বাঁচল না, তার নাম ছিল সারদা। তুমি যদি মেয়ের নামটি সারদা রাখ তো আমার হারানো নিধিকে মনে পড়বে। ভাবব সেই এসেছে তোমার কাছে। দিদি আর আপত্তি করতে পারলেন না। মেয়ের নাম থাকল সারদা। বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হাসলেন—যে কন্যা পরে পরমহংসের পত্নী হবেন তাঁকে তো সার বস্তুই দিতে হবে সংসারকে। সার বস্তু যিনি দান করেন তিনিই তো সারদা। বিধাতার বিধান, একন্যা সার্থকনামা হবেন।

শিশু সারদা তখন ১ বছর ৭ মাসের, শ্রীগদাধর তখন ১৯ বছর অতিক্রম করেছেন। সেই সময় কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে একটি ঘটনা ঘটল। শুদ্র রমণী রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। বহুকাল আগে বান রাজারা এখানে দক্ষিণেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই থেকে গ্রামটি শিবভূমি, নাম দক্ষিণেশ্বর। শিবের ভূমিতে শিবানী প্রতিষ্ঠিতা হলেন। এ মন্দির প্রতিষ্ঠায় দেশকালের